২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

কৃষ্ণচরিত্র

[কিশোর-কিশোরীদের পাঠোপযোগী
সংক্ষেপিত সংস্করণ]

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদীপঙ্কর ভট্টাচার্য

ভূমিকা

ভারতবর্ষের বহু হিন্দুর বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার এবং মানব-অবতারে তিনি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। অথচ ভগবানের অবতার এবং পুরুষ-শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি বাল্যকালে পরের ননী-মাখন চুরি করিতেন, গোপীদের দুধের ভাঁড় ভাঙ্গিয়া তাহাদের অনিষ্ট করিতেন এবং যৌবনে শাঠ্য, কাপট্য এবং বিবিধ অনাচার করিতেন...এ সব গল্প তাঁহার অবতারত্বের সহিত একেবারে খাপ না খাইলেও এ সব গল্প মানিয়া লইতে আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে বাধে না, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে!

বাঙলার ঋষিকল্প মহিমান্বিত সাহিত্যগুরু ও চিন্তানায়ক কিন্তু এ সম্বন্ধে নীরব থাকেন নাই। মহাভারত এবং সমস্ত পুরাণ অনুশীলন করিয়া তিনি প্রমাণ-প্রয়োগে দেখাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ও সব কথা নিছক গল্প—নিতান্ত অসম্ভব গল্প! এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তিপ্রমাণ-সমন্বিত বিরাট গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—সে অমূল্য গ্রন্থ...কৃষ্ণচরিত্র।

'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"যখন আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয় ঘোষণা করিতেছিলেন, তখন তিনি বীরদর্প-সহকারে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা উন্নততররূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়ন পূর্ব্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

"তিনি বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না—সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম

আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া পুজা করিব। তাহার পর তিনি দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র, তাহাই বিশ্বাস্য নহে; যাহা বিশ্বাস্য, তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্ম-শক্তি—ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলিয়াছেন—"কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ঐতিহাসিক সমালোচনা এই প্রথম।…কৃষ্ণচরিত্র বঙ্গসাহিত্যে পরম সম্পদ—সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।"

আমাদের মধ্যে ক'জন এ গ্রন্থ পড়েন? না পড়িবার একটি হেতু, মনে হয়, গ্রন্থে নানা শাস্ত্র-পুরাণের কথা তুলিয়া অমর-কীর্ত্তি রচয়িতা নিপুণ যুক্তিতে সেগুলির বিচার করিয়া তবে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—খুঁটিনাটী সে সব যুক্তি-তর্কের গহনে প্রবেশ করিতে অনেকে হয়তো ভরসা পান না। অথচ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সত্য-তথ্য জানিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে… এ কথা অস্বীকার করা চলে না। এই গ্রন্থ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে সত্য ধারণা, বিশেষতঃ পুরাণাদির নানা অবাস্তব এবং পরস্পর-বিরোধী কাহিনীর সত্যরূপ নির্ণয়, প্রত্যেক বাঙালীর ছোট বয়স হইতে না হইলেও কিশোর বয়স হইতে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এ গ্রন্থে সুদৃঢ় যুক্তির দ্বারা লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ভগবানের অবতার বলিয়া সকলে না মানিলেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সকল দিক দিয়া আদর্শ-পুরুষ…এ-কথা সকলকেই মানিতে হইবে।

প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর পাঠোপযোগী করিয়া বহু যত্নে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের এই সংক্ষেপিত সংস্করণ সম্পাদিত হইয়াছে। ইতি

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৬২

সম্পাদক

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম খণ্ড

উপক্রমণিকা

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙলা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন; ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি-অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ-ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফলে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল উপাখ্যান জন-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি; জানিয়াছি, ঈদৃশ

সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ-চরিত্র আর কোথায় নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, জানিবার উপায় কি ?

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়ঃ

(১) মহাভারত। (২) হরিবংশ। (৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণ-বৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিতগুলিতে আছে।

(১) ব্রহ্মপুরাণ। (২) পদ্মপুরাণ। (৩) বিষ্ণুপুরাণ।

(৪) বায়ুপুরাণ। (৫) শ্রীমদ্ভাগবত।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ। (১১) স্কন্দপুরাণ।

(১৪) বামন পুরাণ। (১৫) কূর্ম্মপুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায়; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃন্দাবন

যদুবংশ

আয়ু ঐতিহাসিক রাজা। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পূরু।

যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পূরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এবং আজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন-যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পূরুর বংশ এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ।

এই যদুবংশেই মধু, সত্ত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা একত্র মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন,

তখন কংস প্রীতিপূর্ব্বক, তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু বসুদেব ও দেবকীকে কংস অবরুদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন, এবং যথাকালে রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাত্রিতেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্ব-ভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন-কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন। এই সময়ে সে অতিশয় দুরাচার হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন।

শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব-সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে।

পূতনা-বধ। পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী! পূতনা আসলে রাক্ষসী নহে; আমরা যাহাকে 'পেঁচোয় পাওয়া' বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সে রোগের নাম পূতনা। শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। ইহাই পূতনা-বধ।

মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখানো। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

তৃণাবর্ত্ত। তৃণাবর্ত্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অলৌকিক। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণুপুরাণেও এ কথা নাই, মহাভারতেও নাই।

যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা" করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জ্জুন নামে দুইটী গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন; গাছের মূলে উদূখল বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্যাপারটি কি? অর্জ্জুন বলে কুরচি-গাছকে; যমলার্জ্জুন অর্থে যোড়া কুরচি-গাছ। কুরচি-গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। . .

কৈশোর-লীলা

বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন,—(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক।

কালিয়-দমনের কথা রূপক। রূপক এই ঃ—কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িতভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। বিপদাবর্ত্তে ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তি বিকাশপূর্ব্বক, অভয়বংশীবাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত

হইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কাল-তরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কাল-স্রোতস্বতীর আবর্ত্তমধ্যে অমঙ্গল-ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়-বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে এক পর্ব্বত ছিল, এখনও আছে।

বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল—দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়াই আমরা ও গোপগণ জীবন ধারণ করি, এবং গো-সকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানোই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান।

তাহাই হইল। অনেক দীন-দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্ত্তিমান্ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

কংস-বধ

এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরাম অতিশয় বলশালী হইয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টম-গর্ভজা বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা; বসুদেব সন্তান পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূর-নামা একজন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এদিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্ম্মুখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অক্রূর কর্ত্তৃক তথায় আনীত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণুর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা

করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও নিহত করিলেন; পরে বসুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে· ·যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না; কেন না, ধর্ম্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিলেন। ধর্ম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান। তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাঁহার রাজ্য, তাঁহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মার্থ মাত্র বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। এই কংস-বধেই দেখি, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরহিতরত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই, তিনি আদর্শ-মনুষ্য।

শিক্ষা

পুরাণে কথিত আছে যে, কংস-বধের পর কৃষ্ণ-বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থ গমন করিলেন, এবং চতুঃষষ্টি দিবসমধ্যে. শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা-প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। আমরা বুঝি, তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া, চক্ষু বুজিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা! কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন।

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতে ঐষীক পর্ব্বে লিখিত আছে, অশ্বত্থামা-প্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃত শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শ-মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ-শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না।

জরাসন্ধ

ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধে এক এক জন সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবর্ত্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্ত-বংশীয়েরা, হর্ষবর্দ্ধন, শিলাদিত্য এবং আধুনিক সময়ে পাঠান ও মোগল—ইঁহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দু-রাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তর-ভারতে সম্রাট্। এই সম্রাট্ বিখ্যাত জরাসন্ধ। জরাসন্ধের বল ও প্রতাপ ছিল অপরিসীম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী কুরুপক্ষে যোগদান করিয়াছিল।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কংস-বধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাগণ জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহন্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন; কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইলেন, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে

যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদব-দিগের ক্ষুদ্রসৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়-বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্ম্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক-পর্ব্বতে দ্বারকারক্ষার্থ দুর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারকা যাইবার পূর্ব্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায়, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। বোধ হয়, শক, হূণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতি-মাত্রকেই যবন বলা হইত। যাহা হউক, ঐ সময়ে কালযবন নামে একজন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতিপ্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমর-রহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র যাদবসেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। তাছাড়া সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ

প্রাণিহত্যা-পক্ষে ধর্ম্ম্য প্রয়োজনীয় ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত। সে সময় যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ, স্বজনরক্ষার্থ এবং প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্ম্মিকের তাহাই কর্ত্তব্য। যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন-হানি না হইয়া জরাসন্ধ-বধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্য কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধ-বিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত। কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিল না। কৃষ্ণ কালযবন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন-স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ-যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে তাহার

সৈন্যসকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ—সেবারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

হংস ও ডিম্ভক নামক দুই বীর জরাসন্ধের অত্যন্ত অনুগত ছিল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, এ দুই বীর এবং জরাসন্ধ—এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে—ইহাদের বধ না করিলে পীড়ন, অত্যাচার এবং লোকক্ষয়ের অন্ত থাকিবে না।

এজন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করিলেন। এ সময়ে হংস নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে নিহত করেন। ডিম্ভক লোকমুখে শুনিল, হংস মরিয়াছে। সে ভাবিল, তাহার সহচর হংস মরিয়াছে! নাম-সাদৃশ্য প্রযুক্ত তাহার এইরূপ মনে হইল। তখন তাহার জীবনে স্পৃহা রহিল না। সে যমুনার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল। ডিম্ভকের সহচর হংস এ সংবাদ শুনিয়া দুঃখভরে যমুনার জলে আত্মসমর্পণ করিল। এ দুই বীরের মৃত্যুতে জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর জরাসন্ধ ভরসা করিয়া আর কখনও মথুরার দিকে ঘেঁষিলেন না।

কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথমা ভার্য্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভ-রাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণে অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণ-শত্রু

জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণ পূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমন-সংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে "হরণ" বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। পাত্র যদি কন্যার অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচার হয়? রুক্মিণী-হরণেও সে দোষ ঘটে নাই। কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা। তাছাড়া সেকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের বিবাহের দুইটা পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল;—এক স্বয়ংবর-বিবাহ, আর এক হরণ। কখন কখন এক বিবাহে দুই রকম ঘটিয়া যাইত; যথা—

কাশি-রাজকন্যা অম্বিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীষ্ম স্বয়ংবর না মানিয়া তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ করিলে, উদ্ধত-স্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত করিতেন।

দ্বারকা-বাস—স্যমন্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে oligarchy বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্দ্ধী। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন; সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ প্রধান ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব বড় থাকিত না। যে বুদ্ধি-বিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহার ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বল-বীর্য্যে বুদ্ধি-বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এই জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহু-রাজ্য-বিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্য-প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, সকলেরই হিত সাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের

প্রতি আদর্শ-মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বল-বিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছেন, নারদের মুখে শুনিয়া ভীষ্ম তাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থি ব্যক্তি যেমন অরণি-কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিদিগের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্যপ্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল-পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃদ, কিন্তু ঐ দুইজনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়। সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও

সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই; আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষা দুঃখীও আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায়, উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।"

এই কথার উদাহরণ-স্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত উল্লেখ করিব।

সত্রাজিৎ নামে একজন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্ব্বজন-লোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতি-বিরোধভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিৎ মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন; চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না। এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া একদিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একেই ভল্লুক। কথিত আছে, সে ত্রেতাযুগে রামের বানর-সেনামধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এদিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন

সে মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন! এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিলেন। তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দিল এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণ সত্রাজিৎকেই মণি প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরস্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিৎ, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন—এই ভয়ে ভীত হইয়া কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্ব্বজন-প্রার্থনীয়া রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিনজন প্রধান যাদব, অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্ম্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুহৃৎ অক্রূর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি সত্রাজিৎকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ যদি তোমাদের

বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইলেন ; এবং কৃষ্ণ একদা বারণাবতে গমন করিলে সত্রাজিৎকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃ-বধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ. তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন. করিয়া বলরামকে সঙ্গে লইয়া শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্ম্মা ও অক্রূরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ-বলরামের সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অক্রূরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার ঘোটকীও পথক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুইক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, "ধিক্ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও ; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রূরও দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আনাইলেন। তখন কৃষ্ণ একদিন সমস্ত যাদগবণকে সমবেত করিয়া, অক্রূরকে বলিলেন, স্যমন্তক মণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রূর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে আমার নিকট এখনই মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সে মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।

এই স্যমন্তক-মণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্য্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কৃষ্ণের বহু বিবাহ

এই স্যমন্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহু বিবাহের কথা আসিয়া পড়িতেছে।

বিষ্ণুপুরাণের মতে রুক্মিণী, জাম্ববতী, সত্যভামা প্রভৃতিকে লইয়া কৃষ্ণের ষোল হাজার একশত এক স্ত্রী; এবং এই সব স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে এবং কৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে কৃষ্ণের

বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র ও প্রতিদিন চারিটি করিয়া পুত্র জন্মিত। হরিবংশে কথিত আছে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আরও চারিটি পত্নী ছিলেন,—জাম্ববতী এবং সত্রাজিতের তিনটি কন্যা—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। এ সব আষাঢ়ে গল্প বলিয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি।

রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আরও পত্নী ছিলেন, ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

অথচ রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণ-মহিষীর পুত্র-পৌত্র কাহাকেও কোন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণী-বংশই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না! এমন হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চপাণ্ডবের সকলেরই একাধিক মহিষী ছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য আদর্শ ধার্ম্মিক ভীষ্ম, কাশীরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত, এ কথাও কোথায় নাই। আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম; কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

দ্রৌপদী-স্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে দেখিতে পাই। সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুতেই সূচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়-দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করেন নাই।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক্ষণে দ্রৌপদী-স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত।

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মণ্ডলমধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। মনুষ্য-বুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহাঁর নাম বৃকোদর"

ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকানো থাকে?" পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন। আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন—স্বাভাবিক মনুষ্য-বুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন—ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। কৃষ্ণের কার্য্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ-মনুষ্য।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জ্জুন ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যতদূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এ বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়—পিতৃস্বসার পুত্র—তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্ম্মিক, যাহা বিনা-যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম ; আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙালী জাতি আজ সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্ম্ম-স্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই ; নিজেও ধর্ম্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনে আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজ-কুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" 'ধর্ম্মতঃ!' ধর্ম্মের কথাটা এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই! সেকালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্ব্বক কখনও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না ; কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যিনি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মবৃত্তিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ে ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্ম-বিস্মৃতদিগের ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ।

ভূপালগণকে কৃষ্ণ বলিলেন, ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না! যিনি ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন; সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব এইরূপ পরিস্ফুট হইতেছে।

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি কর্ত্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল; উৎসব যাহা ছিল, তাহা ফুরাইল; কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া যেখানে ভার্গব-কর্ম্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার কখনও সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কেন

না, মহাভারতকার লিখিয়াছেন "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃষ্বসার পুত্র বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন। কাজটা সাধারণ মৌলিক ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসীত বা মাসীত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গল-কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য-মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্ঘ্য বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহ-সামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস-দাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত-কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।"

পাণ্ডবদিগের তখন এ সকল ছিল না। কেন না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ তাঁহাদের এ সকলের তখন বিশেষ প্রয়োজন ; কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্য-সামগ্রী-সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্ব-স্থানে গমন করিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রা-হরণ

দ্রৌপদী-স্বয়ংবরের পর, সুভদ্রা-হরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশ-পর্য্যটনানন্তর তিনি শেষে দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জ্জুন কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ব্বতে একটা মহান উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন।

তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া পরামর্শ দিলেন, "হে অর্জ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়। স্বয়ংবর-কাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবর-কালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে ?"

এই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন।

কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিত হয় কেন ? তিন কারণে। প্রথম, অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়, কন্যার পিতা-মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয় সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজ-রক্ষার মূল সূত্র, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যা-হরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, তদ্ভিন্ন চতুর্থ কারণ কিছুই নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা

কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল, দেখা যাক্। কৃষ্ণ সুভদ্রার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার 'duty'। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎপাত্রস্থা হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটী"—তিনি যাহাতে সৎপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন অর্জ্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয়, মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট করিয়া প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্ত্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্ত্তব্যসাধন হইতে পারিত কি না, সন্দেহ-স্থল। যেখানে ভাবি ফল চিরজীবনের মঙ্গল—সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গল-সিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথে যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাঁহার প্রতি পরমধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

কন্যাহরণে তৎ-পিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জ্জুন অপাত্রও নহেন, অনভিপ্রেত পাত্রও নহেন। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান।

ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন, বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সে কথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া যাদবেরা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হয় নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বল-প্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল! যাহা সমাজসম্মত, তদ্দারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

খাণ্ডব-দাহ

সুভদ্রা-হরণের পর খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা বড় আষাঢ়ে।

ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য যদি থাকে, তবে এই—পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্রক পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগের বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাহাই করিয়াছিলেন,

তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। তাহারও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। সে অর্জ্জুনের কাছে প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল, অর্জ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি-ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না, কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জ্জুন তাহাকে বলিলেন,—

"হে ময়! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

তবু ময়ের কাতর অনুরোধ।

কিছু কাজ করিতে পারিলে ময় যদি সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিলেন,—

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা বা চীফ্‌ এঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্ম্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভানির্ম্মাণ ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের প্রথম সূত্র।

তিনি সমাজ-সংস্থাপন বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজ-সংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজ-সংস্কার আপনি কোনমতেই ঘটিবে না। আদর্শ-মনুষ্য তাহা জানিতেন, —জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না।

কৃষ্ণের মানবিকতা

আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-মনুষ্য বলিয়াছি। এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ-মনুষ্যস্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য্য করিবেন। তিনি কখনও

কোন লোকাতীত শক্তি দ্বারা কোন লৌকিক অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাঁহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন, তিনি আর মানুষের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে?

অতএব কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথায় অনুমোদন করেন নাই বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

তিনি যত্নপূর্ব্বক মনুষ্যোচিত আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না।

জরাসন্ধ-বধের পরামর্শ

ময়দানবের দ্বারা সভানির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

"আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে। যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজ্য এবং যিনি সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে একজন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে, রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন?

কৃষ্ণ কামক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষ-রহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, "তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নও, কেন না, সম্রাট্ ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকারী হয় না; তুমি সম্রাট্ নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট্। তাঁহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।"

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উঁহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূরকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনিই নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধ-বধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচার-প্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না; আর থাকিলেও যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ততেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে, দ্বৈরথ যুদ্ধে আহূত হইলে, কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিনজন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহূত করিবেন—তিনজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এই বিষয়ে চারিজনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের

বাক্য-শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্রসময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতক-বেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকারদর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈতক-পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন?"

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম

উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষনিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রগল্ভ বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! আমাদের বাহুবল দেখিতে যদি তোমার বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথ-নন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহৃদগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্যসাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না, এই আমাদের নিত্যব্রত।"

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে জরাসন্ধ বলিলেন, "আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত তোমরা নিরপরাধে আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ?"

উত্তরে জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই তিনি বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। তাহার প্রসঙ্গমাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন।

বলিলেন যে, "তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি।" শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন ঃ—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু, আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। কৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ-কংস-শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা —কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভারহরণ" বলিয়াছেন।

ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ

জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, বল। কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম-কিরীট

পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল। (যদি সত্য হয়, বোধ হয়, তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দ্দশ দিবসে বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্ত্তব্য নহে)। ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছু করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিলেন না। তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন,—

"রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন,

আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।”

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

অর্ঘ্যাভিহরণ

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্‌চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া ইহা দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকে মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি-বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইত; বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ্য দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।”

ভীষ্ম যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি যে কৃষ্ণকে দেবতা

বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ তেজঃ, বল ও পরাক্রম-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিতে বলিলেন; ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্ঘ্য দিতে বলিলেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল, তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল এককালীন ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের তিরস্কার করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ্য পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণকে অর্চ্চনা কেন? ঋত্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ্য দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন? ইত্যাদি। অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন। কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুক্কুর ইত্যাদি গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরযোগী আদর্শপুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

আহূত রাজার ক্রোধ দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে

সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীম লৌহনির্ম্মিত—তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায় কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। ভীষ্ম বলিলেন,

"এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই। (১) তিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে।"

শিশুপাল-বধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথ নামা এক মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া

যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন।

যতদিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ-পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণাতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন

না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট-সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল্ কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর, অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না! গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ-কণ্ডুতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল

কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর। তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধেও বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

চক্রাস্ত্রে কৃষ্ণ পিশুপালের মাথা কাটিয়াছিলেন; এ গল্পটি প্রক্ষিপ্ত, মহাভারতে ইহার উল্লেখ নাই। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে—কৃষ্ণ মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপাল-বধের ইতিহাস বলিয়াছেন,— "করূষরাজ-প্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে-শিশুপালের সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।"

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছেন। সেই অপরাধের দমন সমাজের একটি মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি, রাজদণ্ড, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র. আইন, আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে, দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বল প্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে; আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর-বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব।

যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন; এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন; কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে

ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি-উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি-উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এক্ষেত্রে যে বলবান্ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্ত্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ-পুরুষের এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি?

সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন; তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন, যদি অজ্ঞাতবাসের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু কেহ যদি পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য য়াদবেরা আসিয়াছিলেন; এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডবরাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন কৃষ্ণ রাজাদিগকে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া তার পর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

আদর্শ-মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার একতিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তার পর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন।

নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

দ্রুপদ ও সাত্যকি যুদ্ধ মতাবলম্বী। দ্রুপদ যুদ্ধার্থে উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। তিনি এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই।" কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, "যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাহা করিলেন। দুইজনে একদিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক-সমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়কে পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমনহেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য-বদনে কহিলেন, 'হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।'

কৃষ্ণ কহিলেন, 'হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত

আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।' এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক-পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্‌মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।'

ধনঞ্জয়, অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্‌মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্‌মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

সঞ্জয়যান

উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে থাকিলেও দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে।

কৃষ্ণ তথাপি প্রকাশ করিলেন, উভয় পক্ষের হিতসাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনানগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডব-গণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধিসংস্থাপনে সম্মত

হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।”

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্ম্মে, স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য-শক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

কৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার প্রস্তাব

কৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা, দ্রৌপদী সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। কৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ! ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। সংগ্রামে জয়লাভ ও প্রাণ পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বিধাতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন

না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।”

পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এই কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধ না হইলে কর্ম্ম ব্যথিত বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুস্ট হয় না।”

অর্জ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, “উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন-বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”

দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তিনি বলিতেছেন—

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।”

হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল! তুমি যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান, কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর, তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।”

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত্ত, এবং বিদুর সরল, দুর্য্যোধন দুই-ই! তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ছাড়িব না, তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে, আমরা ভয়েই তাঁহার খোসামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎপরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বলবুদ্ধি কৃষ্ণ—কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।”

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কতকগুলা কটূক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্ম্মিত ও রত্নজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশন পূর্ব্বক যে যেমন যোগ্য, তার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু এক দীন-ভবনে চলিলেন।

পরমধার্ম্মিক কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বিদুরের বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য আজিও এ দেশে "বিদুরের খুদ" এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃষ্বসা সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কুন্তী কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ তাঁহাকে যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যতত্ত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হইবেন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন।"

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, "আপনি তাহাদিগকে শত্রু-বিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।"

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধিস্থাপনজন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার

অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যসাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতার কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জ্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। অতএব যে কর্ম্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া কৃষ্ণ পুনরায় কৌরবসভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্য্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "দূতগণ কার্য্য-সমাধানান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।" দুর্য্যোধন তবুও ছাড়ে না, আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

"লোকে হয় প্রীতি পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?"

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে ; কেন না, দুর্য্যোধন কোন মতেই সন্ধিস্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।"

কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

"যদি তিনি (দুর্য্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদসময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখনও আত্মীয় নহে।"

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া কৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।" দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক বুঝাইলেন। সন্ধিস্থাপন দূরে থাক, দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন; দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজ্যশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে, অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বধ না করিলে তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খৃঃ ১৮১৫ অব্দে নেপোলিয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তিনি নিজে, তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত

ছিলেন। সাত্যকি নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জ্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জ্জুন তুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতম যাদব-বীর কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্য পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন; এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে ইহা জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।" ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ-পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন! আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইঁহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন! বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে

পারি, তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতে হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।"

এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কটূক্তি করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন,

"তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয় ; এই নিমিত্তই অসাধ্য অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দ্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ! দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগগণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না ; তুমি কি সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই ? বৎস! হস্ত দ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না ; পাণিতল দ্বারা কখনও পাবক স্পর্শ করা যায় না ; মস্তক দ্বারা কখনও মেদিনী ধারণ করা যায় না ; এবং বল দ্বারাও কখনও কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।"

তারপর বিদুরও দুর্য্যোধনকে ঐরূপ ভর্ৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্‌যানবৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, এবং অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপ প্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ভগবদ্‌গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ-বর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদ্‌গীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করে নাই।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই এখানে দুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সমস্ত লোকই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল! ভগবান্ গীতার একাদশে আরও বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদ-অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় নাই।" কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার

তার প্রত্যক্ষীভূত হইল! গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনন্য-সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাকে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমাকে দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল!

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্য্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল; বল-প্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন; বিদুর বলিলেন; এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বল দ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ-প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাম্ভিক

ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কু-কবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদনীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ-পুরুষ বটে, কেন না, তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা এবং বুদ্ধি সকলই লোকাতীত।

কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদ

কর্ণ মহাবীর পুরুষ। তিনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্য্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সহিত

যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাঁহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তিনি তাহা জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্ম-বৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্য্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃষ্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিবেন, তাহা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে এই কথা শুনাইলেন। বলিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি সেই কন্যার সহোঢ় ও কানীন পুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত

তুমি ধর্ম্মত পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।" তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এজন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চপাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবেন।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ, সর্ব্বজনের ধর্ম্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না—তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন; এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর। কেন না, যুদ্ধ হইলে কেবল তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাত প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম্ম, কেন না, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি বধ না করিয়াও কর্ণের সহিত স্বরাজ্য ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্মাত্মা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে; তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি

জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন ; দুর্য্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন ; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্যলোলুপ, বা তাহাঁদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোনমতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, "যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।"

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই। এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে, বল।"

কৃষ্ণ সব কথা বলিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

ভীষ্মের যুদ্ধ

এই যুদ্ধপর্ব্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশমধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি-দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থানে আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ-পর্ব্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণ-চরিত্রের কোন কথাই নাই। তার পর ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জ্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তারপর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম্ম-প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ-মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্ব্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ যুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে রথ আর চলিবে না। রথ না চলিলেই রথী বিপন্ন হয়েন। সারথিরা যোদ্ধা নহে—বিনা দোষে, বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি হত হন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা জাতিতে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্ত্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি। কিন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ ;—

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কিন্তু অর্জ্জুন

তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, সম্পর্কে ভীষ্ম অর্জ্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধ পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টার্থ তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া যদিও ভীষ্ম ধর্ম্মতঃ অর্জ্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জ্জুন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধসাধনে সম্মত নহেন। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদু যুদ্ধ করেন; পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম অপ্রতিহত-বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্র-হস্তে অর্জ্জুনের রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক পদব্রজে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস!
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গ-গদাসিপাণে!
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ!
রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে॥

• "এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গগদাখড়্গধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।"

অর্জ্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিলেন।

এ ঘটনা দুইবার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ বা ইচ্ছা-বশতঃ দুইবার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথম স্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম-স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও মৌলিকতা ততটুকু স্বীকার করা যাইতে পারে।

এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাসম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র-ধারণ করাইব।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এ সুবুদ্ধি রচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবংবিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম, এই যে—যুদ্ধ করিব না! দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, "আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা একজন গ্রহণ কর; আর একজন আমাকে লও।" "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ" এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম-সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাত্রিতে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জ্জুনের উপরই এ ভার থাক্; অর্জ্জুনও ইহাতে সক্ষম।"

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ইচ্ছা করিলেই ভীষ্মবধ করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না, তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।" অর্জ্জুন সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি

লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজে বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য্য হইল। কার্য্যতঃ তাঁহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অর্জ্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কবি কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আপাতমনোহর শিখণ্ডিসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

জয়দ্রথ-বধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি। দ্রোণপর্ব্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যে কর্ত্তা ও নেতা, এ কথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই।

দ্রোণপর্ব্বে, অভিমন্যু-বধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। যেদিন সপ্তরথী বেড়িয়া অন্যায়পূর্ব্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সেদিন কৃষ্ণার্জ্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত

ছিলেন—ঐ সেনা দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা—এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন অভিমন্যুবধ-বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জ্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন। যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোক-মোহের অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য্য অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। কৃষ্ণ তাহা বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন, "যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধ-মৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম।"

অভিমন্যু-জননী সুভদ্রাকেও কৃষ্ণ ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,

"সৎকুলজাত ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তাহার জন্য শোক করিও না। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্য-পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতি লাভ হইয়াছে। তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা, তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

এ সকলে মাতার শোকনিবারণ হয় না জানি, কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এদিকে পুত্রশোকার্ত্ত অর্জ্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন; না পারেন অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

কৃষ্ণ দেখিলেন, অর্জ্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধু সৌবীর দেশের অধিপতি, বহুসেনার নায়ক এবং দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি; কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধৃগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল—মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে, দ্রোণাচার্য্য ব্যূহরচনা করিবেন; এবং তথায় কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্র হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জ্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, অর্জ্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত!

কৃষ্ণ আপনার সারথি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জ্জুন একদিনে ব্যূহপার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথ-বধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই; অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ ইহা নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ এ যুদ্ধ নহে। আজিকার এ যুদ্ধ অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞাজনিত। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; একদিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্যদিকে অর্জ্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। অর্জ্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে! এ যুদ্ধ পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্ত্তে না। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যা-নিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

পরদিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই।

ঘটোৎকচ-বধ

জয়দ্রথ-বধে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে আর একটা অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জ্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, "একটা

উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটীতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটীতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর।" অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাহার কোল হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচ-বধঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতা-পিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল-বল লইয়া সে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতিযোদ্ধাগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদি দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল! তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুটো রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন এই দিন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্যদিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রিতেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ—রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণ একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না! তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি-সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, একজনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী! কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জ্জুন-বধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল।

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জ্জনা করা যায়; কেন না, বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর!

কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া ও যত্ন করিয়া সন্ধিস্থাপন

করিতে পারেন নাই; বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছা দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই, ভস্ম, জড়পদার্থ একটি শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন এমন নহে। ব্রাহ্মণ বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্য্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;—দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এইজন্য ইঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য বলিত।

ওদিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বড় বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে! মহাভারতকার এই কারণে ব্রাহ্মণ যোদ্ধৃগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বত্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুইজনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন! কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না, ভীষ্মের পর তিনি সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা, তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয় লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্ম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল! বিশেষতঃ দ্রোণাচার্য্যকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জ্জুন

ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের গুরু, এজন্য অর্জ্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্ব্বকালে দ্রোণাচার্য্যের বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্‌ভূত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনি দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্ম্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়!

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানাদিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছ লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের কিছুই করিতে পারিলেন না; তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই—প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডবপক্ষে স্থির হইল! এই মহাপাপ-মন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে! তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

• "হে পাণ্ডবগণ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাঁহার বিনাশ

করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঁহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।”

অথচ পাতা দশ-বারো পূর্ব্বে যাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,

“আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেই স্থানে অবস্থান করি।”

যিনি ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র এ পর্য্যন্ত আদর্শ-ধার্ম্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, ধর্ম্মে যাঁহার দার্ঢ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তিনি কিনা যাচিয়া বলিতেছেন, “তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর!” তাই বলিতেছি, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি ইঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন!”

অর্জ্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্থামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, “অশ্বত্থামা মরিয়াছেন!” দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র অমিতবলবিক্রমশালী,

এবং শত্রুর অবধ্য—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু 'কুঞ্জর' শব্দটা অব্যক্ত রহিল!

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর স্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র ও বিরত হইয়া দ্রোণ-হস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

"হে ব্রাহ্মণ! যদি স্বধর্ম্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। প্রাণিগণের হিংসা না করাই পণ্ডিতেরা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা-নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণবিনাশ করিতেছেন! আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক

স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না ?”

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে ? ইহাতে দুর্য্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে না পারে বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মাত্মা, তাঁহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ; ইহার পর অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত ! কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন। এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি নিশ্চয় মহাপাপে লিপ্ত ! গ্রন্থকার তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল ! এই অপরাধে তাঁহার নরক-দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন ! আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড নরক-দর্শন মাত্র নহে ;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত !

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্ত্তক, এজন্য কৃষ্ণকেও সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয় ! কিন্তু ইহার উপর এই তত্ত্ব প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও বিধাতা, পাপ-পুণ্য যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপ-পুণ্য কি ? পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না ! এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি

মনুষ্যদেহ-ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণ দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন কি তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

"জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্ত দ্বারা) তুমি কর্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। আমার প্রাপ্তব্য, অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্ত্তী হইবে।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ৩ অঃ, ২০।২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে স্বকার্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্ম্মে মহাপাপের দৃষ্টান্তও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না!

মনোযোগ পূর্ব্বক এই গ্রন্থখানি পড়িলে সহজেই বুঝা যায় যে, সমস্ত মহাভারত অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত বা "প্রথম স্তর"; অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্ত্তী কবিগণকর্ত্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহা নিরূপণ করা কঠিন।

নিরূপণের জন্য কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে একটি এই,—

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশে সুসঙ্গতি থাকে। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।"

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোথাও ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম-ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাস-ঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তেমন অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তু হইতে পারে না! তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্ব্বশালী, ভয়শূন্য ভীমের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাজ্যার্থও নহে, প্রাণরক্ষার্থও নহে। স্থানান্তরে কথিত আছে, অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জ্জুন তাহার নিবারণে অক্ষম; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাস্ত্র সমর-বিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপতিগণ রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন! কৃষ্ণের

আজ্ঞায় অর্জ্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, "আমি শরনিকরনিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্রনিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করত অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃ-পদার্থ ই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুত নাগতুল্য বলশালী; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমি তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্র-নিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডবসমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।" স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আষাঢ়ে মত! হৌক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা হইতেছে। নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্ব্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণপ্রবঞ্চনা কতটা সুসঙ্গত? স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, এই ভীম কি তাহা অবলম্বন করিতে পারেন? দ্রোণাচার্য্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দীপ্ত,

যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীতও নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র, দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় কার্য্যপ্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায় ? মহাভারত প্রণয়ন কি তাঁহার সাধ্য ?

তবে নিহত অশ্বত্থামা-গজের এই গল্প ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত, যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিলাম। কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গতি তদপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণও বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি ; কৃষ্ণে শ্বেতে, তাপে শৈত্যে, মধুরে কর্কশে, রোগে স্বাস্থ্যে, ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ-গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্য কবি-প্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্ব্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছি, তাহার একটির দ্বারায় পরীক্ষা করায় এই হতগজ-বৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটির সূত্র এই যে, দুইটির বিবরণ পরস্পর-বিরোধী হইলে তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বত্থামা-গজের গল্পের সঙ্গে

সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ানো হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে, ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজ এ দেশের লোকে, যে উপায়ে যে কার্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের "ব্রহ্মাস্ত্র" বলে। অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—

'বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচি ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতেছ, অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশ-সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ; অতএব এরূপ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্ত্যলোক-নিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।”

ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি; তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

“হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্ন সহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।”

এই কথার পর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,—

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত ও প্রচণ্ড-বায়ু সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল।

দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিঃস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষি-গণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।”

এখানে দেখা যায়, দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণ পরম্পরার মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণই যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। তার পরও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন) সেই পূর্ব্বোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,—

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয় প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাসন অবস্থাপন পূর্ব্বক তরবারি ধারণ পূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল।

এদিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম-ভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন; এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একাক্ষর দেবমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করত সাধুজনের দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।"

তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পর-বিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্‌টি অন্য লক্ষণ দ্বারা পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামা-বধ-সংবাদ-বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্ব্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। অতএব এই অশ্বত্থামা-বধ-সংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জ্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধ-সাধন জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন।

যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না; কিন্তু ভীম অর্জ্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জ্জুন-শিষ্য যদুবংশীয় সাত্যকি অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সুদসমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুইজনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা লইয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুই পক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন; কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল-মন্দ কিছু বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে! কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না! পাঁচ হাতের কাজ না হইলে অমন ঘটে না!

কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির; যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। এদিকে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই

যে, নিজে যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া, অর্জ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন; কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে?" অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এই আমার উপাংশু ব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব।"

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নহে।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম ঃ—

তাঁহার প্রথম কথা ঃ **অহিংসা পরম ধর্ম্ম**।

কিন্তু এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণ-দৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃশ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি; প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত

করি। একটা শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেক-গুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বলো, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, ইহাতে পাপ নাই, তাহার উত্তরে আমি বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারীকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য; এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরঞ্চ পরম ধর্ম্ম।

কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা: **বরং মিথ্যাবাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।**

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য এই দুয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এই ঃ—নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের মাহাত্ম্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

কৃষ্ণের এই মত। তিনি বলিলেন,

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই গেল স্থূল নীতি। তারপর বর্জ্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু এমন কি কখনও হয়?

প্রথমে বিচার্য্য, কখন মিথ্যা সত্য হয়, এবং সত্য মিথ্যা হয়? উহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই, এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য-মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম-মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,

"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।”

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনই একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মটা ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন,—

“ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব **যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম**।”

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ-নির্দ্দেশ।

যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্ব্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্ম্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্ম্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, “যদি কেহ কাহাকে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে **জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত।** যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।”

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণ কৌশিকের

উপাখ্যান অর্জ্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান এই—

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য-প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, 'হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন।' কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, 'কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে।' তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্য-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু, পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই! যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথন দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের

প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখনও মিথ্যা হয় না, এবং কোনও সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে; সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাঁহার ধর্ম্মবাদ যথার্থ ই হউক, অযথার্থ ই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে!

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই! হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম্ম এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দ্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, সেইখানেই ধর্ম্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয়, সেখানে অধর্ম্ম, ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে সত্য অবলম্বনীয় বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে-সে মীমাংসা করিতে বসিলে মীমাংসা কখনও ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ-মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্য পালনীয়, এরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা না থাকিলে মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবার সম্ভাবনা!

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না, এমন নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি ঋষিদিগেরও মত সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন,

তাহা ধর্ম্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থার নির্দ্দেশ করিলেই লোককে ধর্ম্মানুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে কিজন্য এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জ্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থা বিশেষে অধর্ম্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতাকেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্যসম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদাহরণ দিয়াছেন—

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয় সত্যস্বরূপ হয়।"

কৃষ্ণকথিত সত্য-তত্ত্ব এইরূপ :

১। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোক্তব্য। কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্য-তত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি! যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার করো।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, যদ্দারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া "নমো ভগবতে বাসুদেবায়" বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

কর্ণ-বধ

অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, "অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক একটা কথা বলো, তাহা হইলেই তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে।" অর্জ্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে

অপমানসূচক বাক্যে ভৎর্সিত করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব।" এই বলিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন; বলিলেন, "আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যুস্বরূপ।" কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। অর্জ্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জ্জুনের অশ্বের নিয়ন্তা, তেমনই এখন স্বয়ং অর্জ্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জ্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণ-বধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণ-বধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা।

সেই মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া গেলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণশেষ না করিয়া অর্জ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জ্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে অর্জ্জুনের আরও তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জ্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত অতিদুর্দ্ধর্ষ কার্য্য-সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান,

অভিমন্যুর অন্যায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়নবৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন"; "পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলেন"; ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না; দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে অন্যভাব।

পরে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধের শেষভাগে কর্ণের রথচক্র মাটীতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটীতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জ্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা-প্রার্থনাকালে তিনি অর্জ্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্য কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্ম্মের শাস্তা। তিনি তখন কর্ণকে বলিলেন,

"হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধি-পরতন্ত্র হইয়া

তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা দ্রৌপদীকে, 'হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ করো', এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম-ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? এখন ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও তুমি যে জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না।"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন; তাহার পর পূর্ব্বমত যুদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনবাণে নিহত হইলেন।

দুর্য্যোধন-বধ

কর্ণ মরিলে, দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ব্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় হইয়া কাপুরুষতাকলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

এই দিন পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমস্ত কৌরবসৈন্য নিহত হইল। দুইজন ব্রাহ্মণ কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং স্বয়ং দুর্য্যোধন, এই চারিজন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্য্যোধন পলাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়া ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া তাহাকে ধরিল; কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ করো। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি গদাযুদ্ধ করিব।" কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্য্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহূত করিলে পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন

করিতে হইবে! কেহ কিছু বলিলেন না। সকলেই বলদৃপ্ত, যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্ব্বাহ করিলেন।

দুর্য্যোধন অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্য্যোধন বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; সকলকেই বধ করিব।" তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

সভাপর্ব্বে যখন দ্যূতক্রীড়ার পর দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়াছিলেন, ভীম তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্তশোণিত পান করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি অমৃত পান করিলাম!" দুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে স্বীয় মধ্য ঊরু তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ ঊরু যদি আমি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই!

আজ সেই ঊরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু তাহার একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক—গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির নীচে গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনকে মারিতে পারিলেও প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হইবে না।

তার পর ভীম দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যুদ্ধশেষ

এখানে কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব্ব। স্ত্রীপর্ব্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরগণের স্ত্রীগণেরই ইহাতে আর্ত্তনাদ। এপর্ব্বে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি মাত্র কথা আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধরাজা তাহা চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত; এজন্য এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া শেষে কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত করিলেন; বলিলেন ঃ—

"জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডব পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ— বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমাকে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্ল্লভ তপঃপ্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশত বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি

ও পুত্রহীন এবং বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণ ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।"

কৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এমন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেকদিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেব-দানবগণেরও বধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।"

এইরূপ দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌষলপর্ব্বের পূর্ব্বসূচনা করিয়া রাখিলেন।

বিধি-সংস্থাপন

যুদ্ধাদির অবশেষে অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির আবার এক অগাধ বুদ্ধির খেলা খেলিলেন! তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, "এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব।" অর্জ্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষে ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্ব্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না! ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই কিছু না! শেষে কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষেক করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ করো। ভীষ্ম সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভের উপদেশ দিয়াছিলেন; ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্ম্মের পর শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্ব্ব তিন স্তরে দেখা যায়। প্রথম স্তরে ইহার কঙ্কাল ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্ব্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্ম্মিককে রাজা করিলেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্ম্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা চাই। রণজয় রাজ্যস্থাপনের প্রথম কার্য্যমাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধি-ব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্য্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিবার

বিশেষ কারণ ছিল। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনিই এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি-দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত-শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।"

কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন; বাহানা লইলেন, বনে যাইব! অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় Pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। "আমি এই সকল করিতেছি", "ইহা আমার", "ইহা আমার দুঃখ"—এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই-ই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক

উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে। সেই মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা—এই ধর্ম্ম-নেতৃশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরুষ বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন।

"ব্যাধি দুই প্রকার;—শারীরিক ও মানসিক। এই দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহাকে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ; যখন এই তিন গুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক

উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময়ে কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয়? এক্ষণে সুখ-দুঃখ উভয়ই স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখ-দুঃখাতীত পর-ব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। পূর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, একমাত্র অহঙ্কারের সহিত এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদয় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ চিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়-সমুদয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। অনেকে রাজ্যাদি বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদয়ের চিত্তে অলক্ষিত-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদয়

প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদয় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস-বশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কাম-নিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ সন্দেহ নাই।

আপনি বিধি-পূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনাকে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দর্শন-লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ-সমুদয়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।”

কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা ফুরাইল।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধ-বৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিশূন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন; কেবল অভিমন্যু-বধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায়

গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যু-বধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বলিলেন।

এ দিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়-কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে পুনর্ব্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ-পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যু-পত্নী উত্তরা একটি মৃতপুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন! এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, তাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ-মনুষ্য, এজন্য সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

———

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

যদুবংশ-ধ্বংস

তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর অতি ভয়াবহ মৌষল পর্ব্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ-বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহা-ভয়ানক ব্যাপার-নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

মুষল একেবারে অনৈসর্গিক উপন্যাস, আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে প্রাকৃতিক স্থূল কথা বাকি থাকে, তাহা শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে একবংশীয় নহে, ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের পক্ষে। তার পর যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না; উগ্রসেনকে কখনও রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের

গুণাধিক্য হেতু তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায় ; এবং শান্তি-পর্ব্বে দেখিতে পাই, ভীষ্ম একটি কৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতএব যখন যাদবেরা পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব-স্ব-প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দুর্নীতিপরায়ণ এবং সুরাপান-নিরত, তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যদুকুল ক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ-বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন! অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে কোন প্রয়োজন নাই ; কেবল দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকূল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রে অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ-মনুষ্য, আদর্শ-মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই—আদর্শ-পুরুষের ধর্ম্মই আত্মীয়। যদুবংশীয়েরা যখন অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্ম্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তখন কর্ত্তব্য-বোধে তিনি যাদবগণকে অধর্ম্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্ম্মের বন্ধু নহেন—আত্মীয়গণের বন্ধু,

আপনার বন্ধু—ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন—আপনার পক্ষপাতী! আদর্শ ধর্ম্মাত্মা তাহা হইতে পারেন না—কৃষ্ণ তাহা হয়েন নাই।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ জুলিয়স সীজারের মত দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটায় বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাঁহারা যোগাভ্যাস-কালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনা গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ; সুতরাং আদর্শ-মনুষ্যের অনাচরণীয়! আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন-বয়সে জীবনের কার্য্য, সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না "ঈশ্বর-প্রাপ্তি" বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি—জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরা ব্যাধের শরাঘাত।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে। এ জরা—ব্যাধি নয় ত ?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা-পূরণ জন্য তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের জন্ম-মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

উপসংহার

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্র-জন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেই কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণ-কালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালন-বিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এত বল এবং বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বলিয়া, তিনি সে সময়ের

ক্ষত্রিয়-সমাজের সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধাগণের সঙ্গে এবং অন্যান্য. বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধসম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বল ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা একজন সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈন্যাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈন্যাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধাগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না; ভীষ্মের বা অর্জ্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈন্যাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় জরাসন্ধ-যুদ্ধে। তাঁহার সৈন্যাপত্য-গুণে ক্ষুদ্র যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিলেন। অগণনীয় সেনার ক্ষয় যাদবসেনা দ্বারা অসাধ্য জানিয়া, মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ম্মাণার্থ সাগর-দ্বীপ দ্বারকার নির্ব্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্ম্মাণ যে রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন

ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্র-প্রসূত নহে!

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাও ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘ্যপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল যে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমন নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বলোকহিতকর, সর্ব্বজনের আচরণীয় ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। এই ধর্ম্মে যে জ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষী শক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ করেন, আমি ইহা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, ও প্রমাণীকৃতও করিতেছি। কেবল এই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্তজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকল চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও, কৃষ্ণের পরামর্শ

ব্যতীত রাজসূয়-যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্য-স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্ম্য উপায়। ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের পর ধর্ম্মরাজ্য-শাসনের জন্য রাজধর্ম্ম-নিয়োগে ভীষ্ম দ্বারা রাজ-ব্যবস্থা-সংস্থাপন করানো, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতি-প্রশংসনীয় উদাহরণ।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্ব্ব-ব্যাপিনী, সর্ব্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবনী, ইহা আমরা পুনঃপুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি, অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জ্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথ-বধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্ব্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লোকহিতার্থে তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি

সর্ব্বলোকহিতৈষী; কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্য্যগ্-যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত-চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিংবদন্তীমূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ রদ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি; আবার ইহাও দেখিয়াছি, আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাঁহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার দেখিয়াছি, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনির্ম্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থ স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল, পাণ্ডবের ন্যায়, শিশুপালও পিতৃষ্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য।

কেবল একটা কথা বাকি আছে। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিলাম কই? কিন্তু তিনি যদি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন করিলেই

উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। কৃষ্ণ আত্মারাম, আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রতিবিশিষ্ট।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তি দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন;—"the wisest and greatest of the Hindus". আর যিনি বুঝিবেন, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীতভাবে এই গ্রন্থ-সমাপন-কালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণা কারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥